মিহির কান্তির বইয়ের ভুবন

ছিমছাম ঘর। থরে থরে সাজানো বই। শোভা পাচ্ছে-সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সমসাময়িক বিষয়াবলী, দর্শন বিষয়ক নানা রচনাবলী। এ যেন বইয়ের এক বিশাল ভাণ্ডার। বলতে গেলে বইয়ের সঙ্গেই তার বাস। হররোজ পাচ-ছয় ঘণ্টা বই পড়ে সময় কাটে তার। তিনি মিহির কান্তি চৌধুরী। পরিচিতি কবি-গবেষক হিসেবে। একজন একাডেমিশিয়ান হিসেবে সিলেটে তার খ্যাতি আছে।

নগরীর কুমারপাড়া এলাকায় তার বাস। স্থায়ী নিবাস মৌলভীবাজারে বড়লেখার শাহবাজপুরে। ব্যক্তিগত লাইব্রেরি গড়ে তোলার ইতিহাস জানালেন এভাবে- পাকিস্তান পিরিয়ডে আমাদের বাড়িতে বইয়ের কালেকশন ছিল বিপুল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বইগুলো পুড়ে যায়। ১৯৮৪ সালে সিলেট নগরীতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করি একাডেমি টুওয়ার্ডস। প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পারিবারিক চর্চার জন্য বইয়ের সংগ্রহ বাড়াতে থাকি। বর্তমানে লাইব্রেরিতে বইয়ের সংগ্রহ ছাড়িয়ে গেছে ১১ হাজার। লাইব্রেরিটি ঘুরে দেখা গেল, কেবল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর বাংলা, ইংরেজি ও অসমী ভাষায় তার ৪৫০টিরও বেশি বই কালেকশনে আছে।

ইংরেজি ব্যাকগ্রাউন্ডের ছাত্র মিহির কান্তি জানান, প্রফেশনাল কাজ শেষে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তিনি পাচ-ছয় ঘণ্টা বই পড়েন। এটা তার নেশায় পরিণত হয়েছে। ইংরেজি ভাষায় তার তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ওরিয়েন্টাল সান, গ্লিমসেস অফ ঠাকুর ও চর্যাপদের কাব্যানুবাদ। বইপ্রেমী এই মানুষটি তার নিজের বসতঘরের একাংশে আলাদা একটি রুমে গড়ে তুলেছেন লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রিডিংয়ের জন্য আছে আলাদা চেয়ার-টেবিল।

সিরাজুল ইসলাম সিলেট অফিস

৯ বন্ধুর আলোর মিছিল

বেকার ৯ তরুণের 'অনিন্দ সাহিত্য সংসদ পাঠাগার' এলাকার মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে চলেছে। ১৩ বছর আগে চেয়ে-চিন্তে পত্রিকা পড়ে যে আগ্রহ জন্মেছিল, সে আগ্রহই এ রকম একটি পাঠাগার স্থাপনে আগ্রহী করে তোলে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম বড়ভিটার নয় তরুণকে।

প্রথমে একটি পত্রিকা রাখার মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। বর্তমানে এখানে আছে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত লেখকদের আড়াই সহস্রাধিক মূল্যবান গ্রন্থ। প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এলাকার মানুষ কোনো রকম ফি ছাড়াই এখানে বই পড়ার সুযোগ পান। তাদের মধ্যে গরিব ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই বেশি। উদ্যোক্তাদের একজন মহিরউদ্দিন বসুনিয়া জানান, কর্মজীবন শুরুর আগে বেকার থাকার সময় তাদের সময় কাটতো পত্রিকা পড়ে। এ দোকান ও দোকান থেকে চেয়ে পত্রিকা পড়তে গিয়ে তিক্ত কিছু অভিজ্ঞতা হয়। ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি তারা নয় বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নেন একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার। প্রথমে ১২৫ টাকা করে চাদা দিয়ে নয় বন্ধু মিলে বড়ভিটা বাজারে সমাজসেবা অধিদফতরের পরিত্যক্ত একটি ঘরে টেবিল আর কয়েকটি চেয়ার কিনে নিজেরাই একটি পত্রিকা রাখা শুরু করেন।

তৈফুর, আরশাদ, মাহমুদ, আফজালুল, মহিরউদ্দিন, মুকুল, আবু হেনা, গোলাম সাদেক ও শফিকুল ইসলামের প্রতিষ্ঠিত অনিন্দ সাহিত্য সংসদ পাঠাগার পরিচালনায় এখন গঠিত হয়েছে ১১ সদস্যের একটি কমিটি। এখন নিয়মিত ৩৫ জন সদস্য প্রতি মাসে ২০ টাকা করে চাদা দেন। একজন কেয়ারটেকারের বেতন দেয়ার পর অবশিষ্ট টাকা দিয়ে প্রতি মাসেই পাঠাগারে সংযোজিত হচ্ছে নতুন বই। কয়েক মাস আগে জেলা পরিষদ থেকে পাওয়া ৫২ হাজার টাকায় কিছু আসবাবপত্র তৈরি করা হলেও পরিত্যক্ত ঘরের ছাদ চুয়ে পানি পড়ে নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান অনেক গ্রন্থ। এলাকার মানুষ চায়, গ্রন্থাগারটি আরো বড় হোক। এ জন্য তারা সরকারি সহায়তা প্রত্যাশা করেন।

সাদেক আনোয়ার প্রিন্স নীলফামারী

দই বেচেন বই কেনেন জিয়াউল

নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি। এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে গড়ে তুলেছেন জিয়াউল হক সাধারণ পাঠাগার। আর তিনি এ কাজটি করেছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সহায়তা ও নিজ হাতে তৈরি দই বিক্রি করে। চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা শহর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে সীমান্তবর্তী উপজেলা ভোলাহাটের প্রত্যন্ত গ্রাম মুসরিভুজায় গড়ে উঠেছে আলোচিত এ পাঠাগার। প্রায় ৩০ বছর ধরে জিয়াউল হক সাধারণ পাঠাগার শত শত দরিদ্র শিক্ষার্থীকে বিনামূলে বই সরবরাহ করে আসছে।

পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউল হক ১৯৩৮ সালে চামা মুসরিভুজা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে পঞ্চম শ্রেণীর বেশি এগোনো হয়নি। ততোদিন তিনি জড়িয়ে পড়েন পৈতৃক পেশা দই বিক্রি কাজে। পারিবারিক অভাবের কারণে লেখাপড়া না করতে পারার কষ্ট তাকে তাড়িত করতো সব সময়। লেখাপড়া না করতে পারার কষ্ট থেকে জিয়াউল হককে পেয়ে বসে বই কেনার নেশা। ১৯৬৯ সালে প্রথমে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাচ সেট বই কিনে যাত্রা শুরু হয় জিয়াউল সাধারণ পাঠাগারের। এরপর আর থেমে থাকেননি তিনি। সারা দিন দই বিক্রি করে উপার্জিত অর্থ থেকে কিনতে শুরু করেন বই। ১৯৭৬ সালে বাড়ির একটি ঘরে প্রথমে গড়ে তোলেন পারিবারিক পাঠাগার। এভাবেই বিগত ৩০ বছরে গড়ে উঠেছে বইয়ের বিশাল ভাণ্ডার। অভাব-অনটনের মাঝে সমাজে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে জিয়াউল হকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগের কথা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ হলে এগিয়ে আসেন সমাজের অনেক মানুষ। তাদের বই আর অর্থ সহায়তায় তিলে তিলে এখানে স্থান পেয়েছে প্রায় ২০ হাজার বই।

শহীদুল হুদা অলক চাপাই নবাবগঞ্জ

বই পোকা মোশাররফ

পাখি ডাকা নিভৃত পল্লী কাচাপাকা রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষসারি আর ধানের ক্ষেত। নির্জন এ পল্লী নওগার বদলগাছীর ভাতসাইল গ্রাম। এ পল্লীকে আলোকিত করেছেন মৃত মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর ছেলে মোশাররফ হোসেন চৌধুরী। বয়স তার ৭০ ছাড়িয়েছে। কিন্তু এখনো তার দৃঢ় মনোবল। এ মানুষটি একক প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করেছেন প্রাচীন পুথি, গ্রন্থ ও আধুনিক পত্রিকাসহ বিভিন্ন বই। যার সংখ্যা এখন ১৫ হাজার ৭০০। নাটোরের নির্মল চন্দ্র নামে তার এক বন্ধু দেশ ত্যাগ করার সময় ১৯৫৭ সালে তাকে প্রাচীন কিছু পাণ্ডুলিপি দিয়ে যায়। এরপর প্রফেসর হবিবর রহমানও তাকে কিছু পাণ্ডুলিপি দেন। তার টিনসেট লাইব্রেরিতে তিনটি কক্ষে চাপাচাপি করে রাখা আছে কাঠ ও গ্রিল মিলিয়ে ৪৭টি আলমিরা। গল্প, উপন্যাস থেকে শুরু করে আছে নানা ধরনের বই। সাধারণ গবেষণা, পত্রিকা, ইংরেজি ও ধর্মীয় এভাবে পাচটি বিভাগ আছে লাইব্রেরিতে। এখানে প্রবন্ধের বই আছে ৬৫৭টি, উপন্যাস ১ হাজার ১৭২টি, ইতিহাস ৪৮৫টি, আইন ও রাজনীতি ২৭৩টি, কবিতা ও বটতলার কবিতা ৪৩২টি, জীবনী ৫৭১টি, সংকলন ৬৪টি, ভ্রমণ ১২৮টি, নাটক ১৮৫টি, গল্প ৭৯১টি, বিজ্ঞান ২৯৫টি, গ্রন্থাবলী ও রচনাবলী ১৩০টি, ধর্মীয় ৫২৫টি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ২৮টি, আরবি ও উর্দু ৮৫টি এবং অন্য ৫২৬টি বই আছে এ লাইব্রেরিতে। এছাড়াও আছে পত্রিকাসহ বিভিন্ন ধরনের ১০,২৭৬টি বই। আরো আছে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র। তিনি পুরনো জমিদার বাড়ি থেকে প্রায় ৭৭টি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। এর কিছু বাংলায় কিছু সংস্কৃত ভাষায়। এগুলো তালপাতা, কলাগাছের বাকল ও হাতে তৈরি কাগজে লেখা। এ পাণ্ডুলিপিগুলো ২৫০ বছরের পুরনো। তবে এগুলোতে সঠিকভাবে কি লেখা আছে এখনো তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এখানে প্রায় ২৫০ বছর আগে হাতে লেখা কোরআন শরিফ আছে।

ফরিদুল করিম নওগা

01 FEB 2008